ষষ্ঠ অধ্যায়

বরাকের চা জনগোষ্ঠী এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও ত্রিপুরা অঞ্চলের চা বাগানের জনসমাজ

চায়ের চাষ আসামের প্রধান শিল্প । শুধুমাত্র রাজ্যের নয় জেলার মানে বরাক উপত্যকার আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিতে এর অবদান অনস্বীকার্য । চা শিল্পের জন্যই অন্যান্য অঞ্চলের সংগে এর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো রয়েছে। 'বরাক উপত্যকা' আসামের দক্ষিণে অবস্থিত । এর আরেকটি নাম হচ্ছে 'পূর্ববঙ্গ' বা 'ঈশানবঙ্গ' বিভাজনের আগে এর নাম ছিল 'সুরমা-বরাক'। মূলত 'বরাকনদী' থেকেই 'বরাক উপত্যকা' নামটি এসেছে । এখানে অন্যান্য আর সব জনজাতির মধ্যে রয়েছে বাঁশির সুরে, মাদলের তালে ঝুমুর গানে মন মাতিয়ে তোলা চা জনজাতি সংস্কৃতি । ইংরাজি ১৮৫৬ সালে উইলিয়াম সন এণ্ড কোম্পানীর হাত ধরে শুরু হয় বরাক উপত্যকায় চা বাগান । প্রথম চা বাগান বরসাঙ্গন । এখানে শুরুর দিকে শ্রমিকরা নাগা, লুসাই, ডিমাসা প্রভৃতিরা থাকলেও পরে আড়কাঠি সহযোগে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বরাক উপত্যকায় উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদেনিপুর, ছোটনাগপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, ওড়িশা, মাদ্রাজ, ঝাড়খণ্ড ও অন্দ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দলে দলে পুরুষ মহিলা ও শিশুদের বরাক উপত্যকার চা বাগান গুলোতে আনা হয় । চুক্তির ভিত্তিতে তাঁদের কাজে নিয়োগ করা হয় একসময় কাজ করতে করতে চুক্তি শেষ হয়ে যায় কিন্তু তাদেরকে এখানেই থেকে যেতে হয়, হয়তো বাধ্য হয়েই তাদেরকে থাকতে

হয়েছে। পুঁজির লক্ষ্যই তো হচ্ছে আসলে সস্তায় শ্রম পাওয়া। এই ব্যাপার বরাক উপত্যকার সাথে ভিন্ন উপত্যকার চা বাগানের জনসমাজ নিয়ে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে যে সব কটা বাগানের অবস্থান কি রকম। ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত ধরেই মূলত চা বাগানের শুরু হয়, তাহলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় এসে দাঁড়িয়ে মানে উপনিবেশোত্তর পর্যায়ে এসে একটু তাকিয়ে দেখা যেতেই পারে মূলত অবস্থান কিরকম চা বাগান গুলোর কোথাও কিছু পাল্টাচ্ছে না চা শ্রমিকরা আসলে এখনো ঔপনিবেশিক মুখোশধারি শাসক বর্গের হাতের খেলার পুতুল।

'গাছ হিলালে পয়সা ঝড়ে' এই প্রলোভন দেখিয়ে চা শ্রমিকদের বরাক উপত্যকায় আনা হয়। এরপর চলতে থাকে তাঁদের উপর, ধারাবাহিক অত্যাচার, নির্যাতন। নির্যাতিত হতে হতে একসময় যখন তারা ঠিক করল দেশে পরিজনদের কাছে ফিরে যেতে হবে তখন তারা মূল্ক চলো আন্দোলনে যোগ দেয়, এর ফলস্বরূপ কি হয়েছে সেটা হয়তো ভেবে দেখার বিষয়। তবু ১৯২১ সালে এখানকার চা শ্রমিকরা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন সহযোগে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে ডাকে সারা দিয়ে বেরিয়ে পরে। উপত্যকার ইতিহাসে যা 'চরগোলা এক্সোডাস' নামে খ্যাত। বরাক উপত্যকার চা জনজাতিদের বাস্তব অবস্থান চোখে পড়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে। ওঠে আসে অনেক অজানা তথ্য। এর থেকে বোঝা যায় স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দাঁড়িয়ে নিরুচ্চার বর্গরা পুরোপুরি সোচ্চার হয়ে ওঠতে পারে নি এখনো, উত্তর উপনিবেশিক পাঠ কোথায় বলব আমরা! শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থসামাজিক অবস্থান কোনটাই ভালো বলে চোখে পড়ে নি। ক্ষমতাশালী পুঁজিবাদীদের দ্বারা বরাক উপত্যকার চা জনজাতিরা এখনো শোষিত, বঞ্চিত।

করিমগঞ্জ জেলার শিপেঞ্জুরি (সাবেক মেডলি) চা বাগানের শ্রমিক পঞ্চম পানিকা বয়স, পঁচাত্তর বছর জানান যে সুদূর মধ্যপ্রদেশ থেকে তাঁর 'দাদা-দাদিদের' (দাদু--দিদা) 'গাছ হিলালে টাকা পড়ে' প্রলোভন দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসে ব্রিটিশরা । আধো বাংলায়, আধো ভোজপুরি, আধো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভাষায় তিনি জানান তাঁর দুঃখ কষ্টের কথা । তাঁর কথার মধ্যে ওঠে আসে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা তাঁদের ওপর অত্যাচারের কথা । চা বাগানের বর্তমান অবস্থা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ইংরেজরা পিছে মারত, পেটে মারত না' । তাঁর এই বয়ান এর মধ্যেই আসলে পুরো বর্তমান অবস্থাটা আমাদের কাছে ওঠে আসে। চা বাগানে মূলত রেশন আর বাসস্থান (কোয়ার্টার) এর জন্যই শ্রমিক/কর্মচারিরা কাজ করেন । বাসস্থান এর অবস্থাগুলো কি তা একবার বাগান অঞ্চলে ঘুরে আসলেই দেখা যায় । বাগান অঞ্চলের এটা নিয়ম প্রায় কোথাও নতুন বাড়ি ঘর করা হয় না ওই যা আছে এর মধ্যেই মেরামত চলতে থাকে, খানিকটা মা ঠাকুমার চুড়ি যেমন ঘষে মেজে চলতে থাকে ঠিক সেরকম ।বর্তমান কেন্দ্রিয় সরকার চা বাগানগুলোতে রেশনের ভর্তুকি তুলে নেওয়ার ফলে অনেক চা বাগানেই এখন রেশন বন্ধ । রেশন বন্ধ করে যে তাদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এমনটাও নয় । ১০৫ টাকা দৈনিক মজুরি দিয়েই তাদের করতে হচ্ছে দৈনন্দিন সব কাজ । আগে যেখানে হয়তো রেশনটা তাদের জুটত ০০. ৫৪ পয়সা প্রতি কেজি তে এখন সেখানে দিতে হচ্ছে ২০ টাকা ২৫ টাকা প্রতি কেজিতে । তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি আর্থিক দিক দিয়ে এখনও নিজেদের উন্নত করতে পারেনি চা শ্রমিকরা ।

উত্তর ঔপনিবেশিক চেতনায় এসে বড় বড় শ্রমিক সংগঠন হচ্ছে আন্দোলন হচ্ছে কিন্তু সবই কাগজে পত্রে । আসলে ব্রিটিশ শাসকদের কবল থেকে বেরিয়ে এসে বর্তমান চা শ্রমিকরা পড়ে গেছেন ধনতন্ত্র, ক্ষমতাশালী বা ধনিক সমাজের দাসত্বের কবলে । ফলে চা বাগানের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি। হয়নি তাঁদের থাকার সুবন্দবস্ত । বিশ্বায়নের যুগে এসে দাঁড়িয়ে শিক্ষা থেকে তারা সহস্র যোজন দূরে, ফলে কুসংস্কার তো রয়েইছে সাথে রয়েছে তাঁদের উপর নিপিড়নের কথকতা ।

গোটা রাজ্য জুড়ে ব্রিটিশরা আরকাঠি নিয়োগ করে, চা শ্রমিক যোগাড় করার জন্য । সেইসব আরকাঠিরা সুদূর উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরবঙ্গ ইত্যাদি থেকে ছলে--বলে কৌশলে লোকদের অসমে নিয়ে আসতে প্রলুব্ধ করে কখনো টাকা কখনো গয়না দেখিয়ে তাঁদের লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসে । চা শ্রমিকদের মধ্যে সবথেকে বেশি প্রলুব্ধ হতো সাঁওতালরা । তাঁদের এটা বলে আনা হতো যে চুক্তি শেষ হলে তারা অনেক টাকা নিয়ে ফেরত যাবে বাড়ি ; কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি একসময় চুক্তি শেষ হয়ে গেলেও তারা আর দেশবাড়ি ফিরতে পারে নি । এখানেই থেকে গেল চা বাগানের 'কুলি' হয়ে । যারা রইল বাড়িতে, প্রিয়জনদের অপেক্ষায় তারা তাঁদের দুঃখ কষ্ট ছড়া গানে বলতে লাগল । ডঃ কুমার ভৌমিক সাঁওতালি একটি কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছেন এভাবে

"স্টিমার হুসু হুসু করে আসাম চলে যাচ্ছে
চলে যাচ্ছে আমার বাবা ও মাকে নিয়ে ।
আমাদের বড়লোকেরা আমায় অবহেলা করে ফেলে যাচ্ছে ।

আমার বাবা- মাকে চালান করছে।

আমি যে খুব ছোট একেবারে অসহায়।

ওগো আমার বাবা--ওগো আমার মা

আমি কি করে ঘরে ফিরব।

স্টিমার হুসু হুসু করে আসাম চলে যাচ্ছে।

চা চাষের জন্য যদি আসাম চলে যাও তাহলে তোমার গ্রামে আর

ফিরে আসতে পারবে না।

যারা যারা গিয়েছিল কই তারা তো আর ফিরে এলো না।

আজও তারা কেউ ফিরে এলো না।

তুমি রাগ কোরোনা আমার প্রিয় ...

অনুতাপও কোরোনা।

আমি নিশ্চয়ই আসাম যাব না।

ডাইনীর চেয়েও আরকাঠিরা অনেক খারাপ- অনেক নিষ্ঠুর।

আরকাঠিরা রক্ত খায়না সত্য

তবে তারা আর সব কিছু খায়।

অনেক আগে তারা আমার দাদুকে নিয়ে চলে গেছে।

এখনও দাদু ফিরে এলো না।

দাদুকে তারা হাড়িয়া (দেশি মদ) খাওয়াব বলে নিয়ে গেছে।

লোভ দেখিয়ে

দাদু আর ফিরে এলো না।

আমাদের বাহামুখি বিয়ের পর আসাম চলে যাবে।

আসাম যাবে সে চায়ের পাতা তুলতে।

আমি আসাম যাব না- ওগো আমার মা ।

চা- বাগানের মালিকরা ভাল না ।

আমাকে কাজে পাঠিও না,

বরং জামাই ছেড়ে থেকে যাব ।”[১]

-১৮৮২ সালে ‘ইনল্যান্ড এমিগ্রেশন অ্যাক্ট’ অনুসারে শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করা হয় । আইন অনুযায়ী একটা শ্রমিকের তার সই করা যুক্তিপত্র সম্পর্কে, স্থান চাকরির ধরণ, সময়সীমা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার ভাবে জানা দরকার । কিন্তু সেরকম কিছু হয় নি, সদর দপ্তর থেকে তখন শ্রমিকদের কিছু ছকে বাঁধা প্রশ্ন ও জবাব শিখিয়ে দিয়ে তাদের নাম নথিভুক্ত করা হয় । সেই ধরণ হল

প্রশ্ন	উত্তর
(রেজিস্ট্রি দপ্তরের কর্মচারী)	(স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমবেত কণ্ঠে)
১/ তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?	আসাম
২/ কয় বছরের জন্য যাচ্ছ ?	পাঁচ
৩/ তোমরা কি কাজ করবে ? ..... -	পুরুষ কণ্ঠে ক্ষেত নিড়ানোর কাজ । স্ত্রী কণ্ঠে- চা পাতা তুলব ।
৪/ তোমরা কি হারে বেতন পাবে ? .... -	পুরুষ প্রথম তিন বছর ৫ টাকা

ও শেষের দুই বছর ৬ টাকা করে।

- স্ত্রী প্রথম তিন বছর ৪ টাকা ও শেষ দুই বছর ৫ টাকা হিসাবে ।

৫/ তোমাদের খাওয়ার চাল কি দামে দেওয়ার কথা হয়েছে ? ..... -স্ত্রী পুরুষ এক সংগে ৩ টাকা মন দরে ।

৬/ চালের দাম যদি তিন টাকার বেশি হয় তবে বাড়তি পয়সা কে দেবে ? ..... সরকার (নিয়োগবার্তা) দেবে ।[২]

ব্যাস চুক্তি পত্রে সই করিয়ে নেওয়া হয় তাদের দিয়ে, আর যারা স্বেচ্ছায় সই করে নি তাদের জোর করে করিয়ে নেওয়া হয় । এবং যে গন্তব্যে 'আসাম' এ তাদের পাঠানো হয় সেই জায়গা সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র জানতে দেওয়া হয় নি কি রকম । তারা শুধু জানত 'আসাম' যাচ্ছে। চলে আসে আমাদের বরাক উপত্যকায় ও এবং চিরদিনের জন্য বাড়ি ঘর ছেড়ে থেকে যায় তারা পরিজনদের ছেড়ে । শোষিত হয় বঞ্চিত হয় তবু ফিরে যেতে পারে না বাড়ি ।

বরাক উপত্যকার চা জনজাতিরা বেঁচে থাকার জন্য যে তিনটি প্রয়োজনীয় জিনিষ খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান এই তিনটি দিক দিয়েই একেবারে সচ্ছল নয় বললে কোথাও ভুল বলা হবে না । বর্তমান কেন্দ্রিয় সরকার গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে কত কিছুই না করেছে, কিন্তু খুব সোজা ভাষায় বললে উপত্যকার চা বাগানগুলো, আর্থ সামাজিক অবস্থা ঔপনিবেশিক আমলে যা

ছিল উত্তর ঔপনিবেশিক আমলে ও এর খুব একটা পরিবর্তন কোথাও হয় নি। লাঞ্ছনা, বঞ্চনার শিকার তারা আজও। স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবদিক থেকেই তারা নিপীড়িত । শিক্ষার দিক দিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান এর দরুন যেখানে প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত করা হচ্ছে সেখানে উপত্যকার চা বাগানগুলো আজও এর থেকে সহস্র যোজন দূরে, দূরে বলেই জনজাতিদের মধ্যে আজও প্রায় চল্লিশ শতাংশের মধ্যে প্রচলিত ধারণা রয়েছে শিক্ষা সম্বন্ধে যে 'লিখা পড়া শিখে কি হবেক' । ভারত সরকার যেখানে গ্রামে গঞ্জে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে, শৌচালয়ের ব্যবস্থা করছে সেখানে চা বাগানগুলো যথারীতিই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল । চা বাগান গুলোতে অনেক বাগানেই নামেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ (পিএইচই) রয়েছে অথচ জলের কোনও ব্যবস্থা নেই এরকম বাগানের সংখ্যা ও কম নয় । সরকারি প্রকল্প এলে কাগজে পত্রে কুয়ো রয়েছে দেখানো হয় যেখানে বাস্তবে তারা স্থানীয় নদীর উপর নির্ভরশীল । বসন্তের মাতাল সমীরণে যখন জলাশয় গুলো সব শুকিয়ে যায় চা বাগান গুলোতে গেলে তখন চোখে পড়ে প্রকৃত অবস্থান, জলের জন্য চা শ্রমিকদের হাহাকার, তাদের ভরসা তখন একটাই 'নগর কীর্তন', স্থানীয় 'আখড়া' (জগন্নাথ ঠাকুরের মন্দির) থেকে কীর্তন নিয়ে বেরিয়ে সবাই বৃষ্টির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে । বোঝা যায় না এটাকে কি বলা যায়, প্রকৃতির নির্মম পরিহাস, নাকি বাগান মালিকদের গাফিলতি !

কথায় বলে 'বন্যেরা বনে সুন্দর' চা বাগান গুলোতে ঠিক এর পরের লাইনটাই প্রযোজ্য বলে মনে হয় যে 'শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' । প্রকৃতি কখনো তার সন্তানদের দূরে ঠেলে রাখে না । ফলে উপত্যকার চা জনজাতিরা হয়তো এই কারণেই ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত

প্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল । বিশ্বায়নের যুগে এখন খেতে পেলেও বাড়িতে একটা টিভি থাকে চা জনজাতিরা এটা থেকে আর পিছিয়ে নয় এখন । তারা ও পেয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া, কিন্তু সরকার থেকে সবাইকে সচেতন করতে টিভিতে যেখানে দেখিয়েই যাচ্ছে দেশের গ্রামে গঞ্জে প্রত্যেক ঘরে ঘরে শৌচালয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে, সেখানে অশিক্ষার ফলেই হয়তো এসব তাদের চোখেও পড়ে না । কয়েকদিন আগে স্থানীয় খবরের কাগজ দৈনিক যুগশঙ্খে জনগণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যে ভারত সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এপ্রিল ২০১৫ এর ভেতরে প্রত্যেক ঘরে শৌচালয় ব্যবস্থা করে নিতে হবে । শৌচালয় ব্যবস্থা সব বাগানে যে নেই তা নয় কিন্তু ২০ শতাংশ থাকলে বাকি ৭০ শতাংশই নেই । যারা একটু লিখতে পড়তে শিখেছে অল্প শিক্ষিত তারা ব্যাপার গুলো বোঝে এবং গিয়ে বলে প্রভুদের কাছে কিন্তু তাদের ও পাবে পাচ্ছে, হবে হচ্ছে বলে আশায় আশায় দিন কাটাতে হয় । ঘুম থেকে ওঠে দাঁত মাজা, শৌচালয়, স্নান সব তাদের খোলা আকাশের নিচে । সারাদিন কাজ করে বিকেলে বাড়ি ফিরতে সময় জঙ্গলের 'লাকড়ি' (জ্বালানির কাঠ) চা গাছের ভাল- পালা দিয়ে মাথায় বোঝা নিয়ে তারা বাড়ি ফিরে বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকরা । জিজ্ঞেস করলে বলে, 'লেকড়ি না লেগলে খাবো কি ?' স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন জাগে সরকার প্রদত্ত রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি কার জন্য?

সুতরাং উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে এসে দাঁড়িয়ে চা বাগান গুলোর অবস্থান দেখে বলতেই হয়, এ কোনো মনগড়া গল্প নয়, নয় কোনো অলীক কাহিনী, আসলেই তারা পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা শোষিত এবং শাসিত । ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে কাছাড় জেলার দেওয়ান চা বাগানের

‘মণ্ডপ লাইন’ এর মহিলা শ্রমিক বিশাখা রী জানান যে সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে নিম ডালের দাতুন দিয়ে দাত ঘষে, কোনো খালা (নালা) কিনারে গিয়ে শৌচালয় সেরে বাড়ি ফিরে লালপানি (নুন দিয়ে লাল চা) সংগে কোনদিন রুটি অথবা কোনোদিন বাশিভাত (পান্তাভাত) খেয়ে সাতটার বাঁশি (সাইরেন) তে কাজে যেতে হয় । চা বাগানে চা পাতা তোলার কাজ করেন বিশাখা রী । চা বাগানে নিয়ম হল ১৮ কেজি তুললে হাজিরা (মানে ১০৫ টাকা) হয় । বিশাখা চেষ্টা করেন যাতে এর বেশি বাড়িয়ে তোলা যায় যাতে টাকাও একটু বেড়ে যায় । দুপুর বারোটায় একবার তাদেরকে ওজন দিতে হয় (চা পাতা মাপা হয়) তখন একবার লাল চা আর বাড়ি থেকে টিফিনে যা নিয়ে যান তা কোনো গাছে লটকে রাখেন সবাই তা নামিয়ে নিয়ে চায়ের সাথে বসে খেয়ে নেন । তারপর আবার শুরু হয় পাতি (চা পাতা) তোলার কাজ, তুলতে তুলতে অনেক দূর চলে যান তারা নিজের জায়গা থেকে বিকেল চারটে আবার শেষ হয় চা পাতা তোলা তখন ওজন দিয়ে (মাপ) দিয়ে লেগে যান রাতের রান্নার জন্য জ্বালানি সংগ্রহে । চা পাতার শুকনো ডাল, জঙ্গলের অন্য গাছের শুকনো ডাল পালার লাকড়ি (জ্বালানি) র বোঝা মাথায় নিয়ে অন্য আরো শ্রমিক বন্ধুদের সাথে গল্প করতে করতে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরেন । বাড়ি ফেরার পর, বাজারবার হলে বাজার ও যান তারপর বাড়ির হাস মুরগি কে খেতে দেন । তারপর রাতের রান্না তাড়াতাড়ি সেড়ে নিতে হয় নইলে কচিবুড়ির বাপের (তাঁর স্বামীর) মাথা গরম হলে বোকা খেতে হয়, একটু বেশি মদ খেয়ে নিলে মারধর ও খেতে হয় তাকে । তাড়াতাড়ি রাতের খাবার সেরে আবার ঘুমিয়েও পড়তে হয় কারণ সকালে আবার উঠতে হয় কাজে যাবার জন্য । বিশাখা রী একজন স্থায়ি (পার্মানেন্ট)

মহিলা শ্রমিক । সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করে তিনি পান ৬৩০ টাকা আর ৩ কেজি চাল, ৩ কেজি আটা । বিশাখা রীর স্বামী আগে চা বাগানে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন মধ্যে একটু অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে তাঁর নাম কেটে তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে দেন । বর্তমানে তিনি মাঝে মাঝে রিকশা চালান । দুই ছেলে দুই মেয়ের সংসার বিশাখার ।

এই বাগানেরই আরেকজন মহিলা শ্রমিক ছয় নং লাইনের মীরা রবিদাস এখন আর বাগানে কাজ করেন না । মীরার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর তাঁর স্বামী মারা যাবার পর স্বামীর নামের কাজটা অন্য একজন নিয়ে নেয়, তাঁর স্বামী চা ঘরে কাজ করতেন । মীরা বর্তমানে বস্তি বাড়িতে বাবুদের বাড়িতে কাজ করেন । তাঁর মতে বাগানের বাইরে কাজ করলে টাকা বেশি এছাড়া বিকেলেই টাকা পেয়ে যান, বাজার হাট করে বাচ্চাদের জন্য খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন, তাঁর দুই ছেলে রয়েছে ঘরে। তাঁর ইচ্ছে বড় ছেলেকে পুজোর পর ব্যাঙ্গালুরু পাঠিয়ে দেবেন । তাঁর মতে চা বাগানে কাজ করে কোনো আজকাল আর পেট ভরে । পেটের খাবার যোগাড় করার জন্য তো বাইরে যেতেই হবে, তিনি শুনেছেন যে ওখানে অনেক টাকা, বাগানের প্রায় অনেক ছেলেমেয়েরাই এখন ব্যাঙ্গালুরু যাচ্ছে । মীরা রবিদাস খুব সুন্দর টুসু গান করেন ।

১/ মুখ ধুঁয়া দাতুনের
খাড়িটা ফেলে আইলাম গো জলেতে
কি অপরাধ করেছিলাম গো
গোকুলের কৃষ্ণ যায় চলে ।

কৃষ্ণ আমার আলিশ বালিশ গো

কৃষ্ণ আমার গলার হার ।

ধরলো ধরলো ডালা গো

এনেছি কামিনী ফুল

ধরি ধরি মনে করি গো

ভ্রমরা কি দেয় ধরা ।

২/ সীতার জনম হইল গো

হালের চাষে জনক রাজার দেশে

রাম ছাড়িল যজ্ঞের ঘোড়া গো

তবু বনের কারণে

কোথায় যাছ চলে যা জানকী

রাম গেল বনে ।

তিনি আরও বলেন, এখন পেটের ভাত যোগাড় করতেই তাঁদের সারাদিন চলে যায়, পরবের কথা মনে থাকে না, গানের চর্চাও হয় না । সত্যি ভাবতে অবাক লাগে এতো সুন্দর গান, সংস্কৃতি যাদের থাকতে পারে তারা অবহেলিত, অত্যাচারিত ।

চা বাগানের চা গাছ বছরের পর বছর ধরে যত্ন করা, কুঁড়ি থেকে বড় করে তোলেন চা শ্রমিকরা । পাতা ছেঁড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে পরি শোধন বা দেশে বিদেশে পাঠানোর সিংহভাগ কৃতিত্বই চা শ্রমিকদের । অথচ সেই শোধনকৃত চা পানের কোনো আর্থিক সংগতি নেই চা শ্রমিকদের । বরাক উপত্যকার কথা তো বলা গেল এবারে একটু ত্রিপুরা অঞ্চল এবং

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা বাগানের জনসমাজ আলোকপাত করে আমরা দেখে নিতে পারি চা বাগানগুলোর প্রকৃত অবস্থান ।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা

-অসমের চা শিল্প ছিল মূলত ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত উদ্যোগ । ইংরাজরা ব্যবসায়িক লাভের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে চা বাগানের উন্নতির কথা ভেবেছিল, কিন্তু চা বাগানের মেরুদণ্ড যারা সেইসব মজদুর বা শ্রমিকদের কোন উন্নতির চেষ্টা করেনি বরঞ্চ অল্প খরচে বরাবরই চেয়েছে তাদের ক্রীতদাস করে রাখতে, এবং কম মুনাফা দিয়ে কাজ আদায় করে নিতে । ফাঁকির ফাঁদে ফেলে আড়কাঠি সহযোগে বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা বাগান গুলোতে । বর্তমানে মোট "৮৫২ টি চা বাগান এবং ৫৮১ টি চা কারখানাতে স্থায়ী শ্রমিক ৫,৩৫,৪৫০ জন এবং অস্থায়ী শ্রমিক ৪,৭৮,৬৩২ জন নিয়োজিত রয়েছে"[৩] রাজ্যের উন্নতি করতে হলে সবার প্রথমে দরকার এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন, বিশেষ করে তাদের আর্থ সামাজিক বিকাশ একান্ত জরুরি। ব্রিটিশরা একসময় এইসব মহিলা আর শিশু শ্রমিকদের সাথে যেরকম ব্যবহার করত স্বাধীনতার আজ ৬৭ বছর পেরিয়ে গেলেও দেশীয় মালিকরাও ব্যবহার একই করে তাদের সাথে । "পানীয় একই, শুধু বোতল বদলেছে"[৪] আজও তাদেরকে দৈনিক মজুরি, রেশন, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য প্রতিদিন সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে ।

বিশ্বায়ন বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ, এটা শুধু শব্দই নয় একটা প্রবাহ, একটা আলোড়ন। এর জাদুকরি প্রভাব বিশ্বজোড়া। আমাদের সামাজিক স্তরে, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে এই বহুচর্চিত শব্দ বিশ্বায়ন। আমাদের সবার কাছে তুলে ধরা হয়েছে মুক্তবাজার। মুক্ত বাণিজ্য এবং মুক্ত অর্থনীতিই আসলে বিশ্বায়নের গতি ত্বরান্বিত করে চলেছে। প্রায় দু'শ বছর ধরে ইতিহাসকে বুকে আঁকড়ে ধরে চা শিল্প অসমের মাটিকে মহান করে তুলেছে। অসমের চা শিল্পে প্রত্যেকে নিজের ধ্বজা উড়ানোর জন্য প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। এইসব দলেরা নিজের পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে অসমের চা শিল্প আধিপত্য বিস্তার করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে, "চা ব্যবসায়ের দ্বারা অধিক মুনাফা আদায় করা এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারী সকলের কল্যাণ সাধনের বিষয়টা তাদের কর্মসূচিতে নেই। চা বাগানগুলোতে থাকা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, শিশুদের ঘর, স্টাফক্লাব, লেবারক্লাব, ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য টাকা খরচায় তাদের ইচ্ছের অভাব দেখা যায়। শ্রমিকদের আবাস/বাসস্থানগুলো যুগযুগ ধরে মেরামত করা বা নতুন করে নির্মাণ করাতে তাদের চরম উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়।"[৫] সুতরাং বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়েও চা বাগানগুলোতে কোথাও খুব একটা উন্নয়নের দিক চোখে পড়ে না।

শৈক্ষিক পরিবেশ ও ভাবনা

শিক্ষাই আসলে কোনও জাতি, সমাজ বা একটা দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যায়। কোন সমাজ শিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে হলে

প্রথমেই দেখতে হবে সেই সমাজের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা। সামাজিক একটা সুস্থ জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাতে হলে সেই সমাজে প্রচলিত থাকা কিছু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করতে হবে। আর সেই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে দূর করতে হলে সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে। চা জনজাতির পূর্বপুরুষ সকলে অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবী লোক। আর "তার ভেতর কুর্মি, কৈরি, চাষা ইত্যাদিরা ভাল কৃষক হিসেবে পরিচয় দিতে পেরেছে। ক্ষেত কৃষির বাইরে অন্যান্য যারা জাতি তারা হল কৈবর্ত, কেওট, জেলে, মাছুয়া, ডোম, কালিন্দি যাদের পেশা ছিল মাছ ধরা এবং বিক্রি করা। তাছাড়া ভগবান রামচন্দ্রের আমল থেকে ঘাট পার করে দেওয়া ঘাটে, ঘাটোয়ার/ঘাটোয়াল, মাঝি, কেওট তারা নৌকো চালিয়ে পেটের ভাত জোগাড় করে চলেছে। মাংসর কারবার করা কসাই শ্রেণির জাতির সংখ্যা বিরল হলেও একেবারে নেই নয়। মেথর, বাসফর জাতির লোকেরা আসলে সমাজসেবক, যারা সমাজজীবনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিল। হাড়ি, মুচি, চর্ম্মকার, রবিদাস/রুইদাস প্রভৃতি জনজাতির লোকেরা জীব জন্তুর ছাল চামড়ার কর্মে নিয়োজিত ছিল। সোনার, সোনারি স্বর্ণকার, সোনা রুপো এবং তামার গয়না গড়ত। লহরা, লোহার, কর্মকার, সকলে লোর অস্ত্র শস্ত্র, কর কুঠরি, দা কুড়ল গড়ত। তাছাড়া রয়েছে তেলি, সাহু, গুঁড়ি বা চুন্দি, ধোবী/ নাপিত/ঠাকুর/শীল। বাঁশ এর তৈরি পাত্রের সাথে যুক্ত ছিল মালী, কাহার প্রভৃতিরা। তাঁতি, তন্তুবায় এবং জোলহা রা রেশম বা পাটের কাজের সাথে যুক্ত ছিল। তড়ি, ডোম এরা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর সাথে যুক্ত, কুমার মাটির বাসন বানানোর কাজ করত।"[৬] তার মানে চা জনজাতির লোকেরা চা

পাতা তোলার পাশাপাশি তাদের জাতিগত ব্যবসার সাথেও জড়িত ছিল। এইসব জনজাতির সন্তান সন্ততিদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য সরকার থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত । বর্তমানে অসমে বসবাসকারি প্রায় সব শ্রেণির লোকেরাই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, শুধু চা জনগোষ্ঠীদের তুলনামূলকভাবে ততটা এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য চোখে পড়ে না । তার প্রধান কারণ হল চা জনজাতির লোকেরা আজও শিক্ষার আলো থেকে দূরে ।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অনেক চা বাগান রয়েছে, যেখানে সুস্থ সামাজিক পরিবেশ খোঁজা বিড়ম্বনা মাত্র । প্রসঙ্গক্রমেই চলে আসে মাদক দ্রব্য সেবনের কথা। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই রয়েছে যারা এসবের বিরোধিতা করে চলেছে । আগের মতো ততটা না দেখা গেলেও পুরোপুরি নির্মূল হয়ে গেছে তাও বলা যাবে না । "সত্যি কথা বলতে গেলে চা শ্রমিকদের লাইনগুলোতে সন্ধ্যা হলেই পরিবেশটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ে । চোখে না দেখলে এটা বিশ্বাস করা যায় না। মাদক দ্রব্য সেবন করে কয়েকজন শ্রমিক গোটা শ্রমিক লাইন এর পরিবেশে একটা হুলুস্থুল কাণ্ডের সৃষ্টি করে । অবশ্য লাইনের সব ব্যক্তি এক নয় ।"[৭] একটা শিশু জন্মের পর থেকেই যে পরিবেশে গড়ে ওঠে সে সেরকমই হয়, ফলস্বরূপ চা বাগানগুলোতে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে সামাজিক পরিবর্তন আনা একটা জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে । অনেক অভিবাবকরা আছে যারা ভাবে লেখাপড়া করে কি হবে, ছেলে মেয়েরা একটু বড় হলেই বাইরে থেকে কি করে দুপয়সা এনে পরিবার চালাতে সাহায্য করবে সেটাই ভাবে । কিছু সংখ্যক শ্রমিক ভাবে অমুকের ছেলে মেয়ে মেট্রিক পাশ করে আর চাকরি কোথায় পেল ? সুতরাং শ্রমিক সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের সামাজিক পরিবেশ কে উন্নত করতে, মানসিক দিক উন্নত

করতে বাগান মালিক এবং সরকার দুপক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে । এবং শ্রমিক সমাজের মধ্যে সেই বোধ টুকু জাগিয়ে তুলতে হবে যে শিক্ষাই যে কোন লোককে জ্ঞানী আর সাহসী করে তোলে । শ্রমিক সমাজ এগিয়ে গেলে দেশও প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে । আজকের দিনেও চা শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থান অনেক অনুন্নত মানের বলেই শিক্ষার দিক দিয়েও অনেকটাই পিছিয়ে । শিক্ষার অভাবই এখনও তাদের মধ্যে আত্মচেতনাবোধ জেগে ওঠে নি । এই ব্যাপার গুলোকে দমন করতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে, চা শ্রমিক আইনের মতে প্রত্যেক চা বাগানে অন্তত একটি করে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় খুলতে হবে । যাতে চা বাগান গুলোতে একটা সুস্থ শৈক্ষিক বাতাবরণ গড়ে তোলা যায় । আসল কথা হল আর্থিক দিক দিয়ে অচল থাকার ফলে চা শ্রমিকরা ছেলে মেয়েদের শিক্ষা প্রদানের থেকেও বেশি ভাবে কি করে তারা দু পয়সা উপার্জন করে পরিবারকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে । ফলে ছেলে মেয়েরা অল্প বয়সেই উপার্জনের খোঁজে বেরোতে হচ্ছে, শিক্ষার অভাবেই তারা মাদক দ্রব্যতে আশক্ত হচ্ছে । ফলে আমাদের মনেহয় সরকার এবং মালিকপক্ষের সহযোগিতায় চা বাগানগুলোতে সাক্ষরতা দিবস পালন করে চা শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে ।

মহিলা শ্রমিক

নারীমুক্তি সমগ্র বিশ্বেই এক আলোড়ন জাগানো বিষয় । নারীর আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক তথা কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সমান করে তোলাই হল নারীবাদের প্রধান লক্ষ্য । রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মহিলা সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা ১৯৮৮ ২০০০ (The National Prespective Plan for

Woman 1988-200) এ মূলত মহিলা সারলিকরনের ব্যাপারটা রয়েছে । তাছাড়া দেশে মহিলার সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন হয়েছে । অথচ চা জনগোষ্ঠীর মহিলা শ্রমিক ওগুলো নিয়ে ওয়াকিবহাল নয় । অনেকগুলো কারণের মধ্যে শিক্ষার অভাবটাই প্রধান কারণ । এছাড়া যা রয়েছে সেটা হচ্ছে বাগান মালিক এবং সরকারের গাফিলতি । তাঁরা এগিয়ে এসে চা মহিলা শ্রমিকদেরকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উৎসাহিত করতে হবে । "অসমের চা জনগোষ্ঠীর মহিলা শ্রমিকরা শুরু থেকেই শোষণের বলি । লাঞ্ছনা, প্রতারণা তথা যন্ত্রণায় জর্জরিত এইসব মহিলা শ্রমিকরা আজও শোষণের কবল থেকে মুক্তির পথের সন্ধান পায় নি । ব্রিটিশের সময় থেকে চা পাতা তোলা, চা গাছ রোপণ, চা গাছ কলম এর মতো কঠিন কাজ পুরুষের মতোই সমান তালে করে চলেছে অথচ আজও । এইসব মহিলা শ্রমিকরা সাপ্তাহিক বেতনভোগী । অর্থাৎ অধিকাংশ মহিলা শ্রমিকের চাকরি নিয়মিত নয় । ফলস্বরূপ এইসব মহিলারা সন্ধ্যাপর্যন্ত কাজ করে শ্রম দিয়েও পুরুষের সমান রেশন থেকে শুরু করে আরও অনেক সুবিধা লাভ করতে পারে না। মহিলা শ্রমিকদের কাছ থেকে অধিক শ্রম আদায় করেও মালিক পক্ষ সেইসব মহিলা শ্রমিককে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রাখে । চা বাগানে তথা নিজের ঘরে সমান শ্রম করে মহিলা শ্রমিকরা, অথচ সেই অনুপাতে পুষ্টিকর খাদ্য খায় না বলে প্রায় ৯৯ শতাংশ মহিলাই রক্তহীনতায় ভোগে।"[৮]

এইসব মহিলা চা শ্রমিকরা সুচিকিৎসার পরামর্শ থেকে কোন সময় বিব্রত হয়ে মন্ত্র তন্ত্রের দিকেও ঝোঁকে । ফলস্বরূপ তান্ত্রিকের তাড়নায় এইসব মহিলা শ্রমিকদের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে পড়ে । একটা সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে চা জনগোষ্ঠীর মহিলারা গর্ভাবস্থায় সময়ে সঠিক ভাবে স্বাস্থ্য

পরীক্ষা করাতে পারে না ফলে প্রায় ৭৬ শতাংশ মহিলাই মৃত সন্তান প্রসব করে অথবা প্রসবের পর মৃত্যু হয় সন্তানের । কখনও গর্ভধারিণীরও মৃত্যু হয়। রোদ, ঝড়তুফান, প্রভৃতিকে উপেক্ষা করেই একজন মহিলা শ্রমিককে দিনের পর দিন চা বাগানে কাজ করে যেতে হয় । কখনও সদ্যজাত শিশুকে পেছনে কোলে নিয়েই বা কোন গাছের নীচে শুইয়ে রেখেই পুরুষের মতো সমান তালে শ্রম দিয়ে চলেছেন এইসব চা মহিলা শ্রমিকরা । নেই কোন উপযুক্ত বিশ্রামের জায়গা, নেই সদ্যজাত শিশুকে রাখার স্থান । বছরের পর বছর এরকমই চলতে থাকে । অন্যদিকে প্রায় ৯০ শতাংশ মহিলাই টিপ সই দেয় । নিরক্ষরতা দূরীকরণের আলো সেইসব মহিলা চা শ্রমিকের কাছে গিয়ে পৌঁছোয় না । শিক্ষার অভাবের ফলেই তো চা মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস আজও বর্তমান । ডাইনি সন্দেহে আজও লোককে হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। শিক্ষার অভাবের জন্যই চা মহিলা শ্রমিকদের উপর যৌন নির্যাতন হয় । এইসব মহিলা চা শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা না ভাবলে নারীমুক্তির কথা, নারী সারলিকরণের কথা অর্থহীন । নারীমুক্তির কথাটাই আসলে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভাবনার সাথে যুক্ত । অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নারী সবল এবং স্বাধীন হলেই নারীমুক্তি সম্ভব । চা মহিলা শ্রমিক এগিয়ে গেলে দেশ ও এগিয়ে যাবে । এর জন্য সমাজ তথা বাগান মালিক এবং সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে ।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাহিত্যের ধর্মই হচ্ছে সত্যকে প্রকাশ করা । সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যই মানব চিন্তাধারার ধারক এবং বাহক । চা জনগোষ্ঠীর ভাষা,

সাহিত্য, সংস্কৃতি সব কিছুর মধ্যে সাম্প্রতিক কালের সামাজিক সংস্কৃতির মননশীলতার প্রতিফলন ঘটে । ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অনেক সৃষ্টিশীল সাহিত্যের মধ্যেও সেখানকার চা জনজাতির কথা উঠে এসেছে । শুধু সৃষ্টিশীল সাহিত্যেই নয়, চা জনজাতির নিজস্ব লোকসাহিত্যের মধ্যেও তাদের জীবন প্রণালী উঠে আসে । রয়েছে চা জনগোষ্ঠীর ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা, লোসংস্কৃতি, লোকনাটক, লোকনৃত্য প্রভৃতি । চা জনজাতির সৃষ্টিশীল সাহিত্যে সবসময় নিষ্পেষিত শ্রমিকদের জনজীবনের কথাই প্রতিফলিত হয়ে আসছে । সাহিত্য হল জাতির দর্পণ। যেখানে সেই সমাজের হাসি-কান্না, সুখদুঃখ বেদনা, হা হুতাশ, জাতির কর্মদক্ষতা, স্বদেশ প্রেম সব ওঠে আসে । শ্রমিকদের দরদী জীবন এবং জীবিকা সময়ের বিবর্তনে আজকের সমাজ সাহিত্যে প্রকাশ করে লোকসংস্কৃতি এবং লোকাচার নিরীক্ষণ করে তাদের বর্তমান অবস্থা অনেকেই তাঁদের লেখালেখিতে তুলে ধরেছেন । অনেকেই রয়েছেন যাদের লেখার চা জনজাতির জীবন জীবিকা ওঠে আসে তাদের মধ্যে, "চেনীরাম কূর্মি, মেঘরাজ কর্মকার, দেউরাম তাসা, নারায়ণ ঘাটোয়ার, সুশীল কুর্মি, সমীর তাঁতি, সঞ্জয় তাঁতি, সনন্ত তাঁতি, বিপিন চন্দ্র মাহাতো, প্রকাশ কুর্মি, মৃদুল কুমার সাহু, দীনেশ্বর তাসা, সুশীল কুমার সুঁড়ি, হরিপ্রসাদ কুর্মি, মনিষ ঠাকুর, পৃথিবী মাঝি, মাঞ্ছারাম পাটোয়ারি, পদুমী গাজলু, উমেশ বরাইক, প্রাণেশ্বর লামাগা, রাজেন রহিদাস, হেমন্ত মাহাতো, অবিনাশ হর, রেখা তাসা, অনিল তাঁতি, জীব প্রকাশ কুর্মি, মাঘোয়া মির্ধা, অরুণ কুমার খেরিয়া, মহেশ্বর গোয়ালা, মৃদুল কুমার সাহু, প্রহ্লাদ তাসা, শচীন্দ্র মোহন মাহাতো, প্রহ্লাদ গোয়ালা, অমল কুমার হর"[৯] প্রমুখরা রয়েছেন ।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চা জনজাতিদের নিয়ে লেখা যে সমস্ত সৃষ্টিশীল সাহিত্য বইরূপে প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো হল, "১। চাহ বাগিচা পূজা পরব ২। চাহ বাগিচার জাতি জনজাতি ৩। চাহ বাগিচার অসমীয়া শব্দ সম্ভার আরু খণ্ড বাক্য এবং ৪। চাহ বাগিচার লোক গীতত বাদ্য সম্ভার মেঘরাজ কর্মকার । ৫।শালুক বচন ৬। চহরাই পরব এবং ৭। দশভুজা দুর্গামাতা নারায়ণ ঘাটোয়ার । ৮।ঝুমুর গীতর মাজেদি বনুয়ার জীবনত এভুমুকি সুশীল কুর্মি । ৯। চাহ বাগিচার জীবন আরু সংস্কৃতি । ১০। টুসু গীতর মাজে মাজে ১১। চাহ মজদুর লোকগীত ১২। করম পূজা আরু ঝুমেই গীত । ১৩। চাহ বাগিচার কথা প্রহ্লাদ চন্দ্র তাসা । ১৪। চাহ শ্রমিক সংস্কৃতির রূপরেখা এবং ১৫। করম পরব (সম্পাদনা গণেশ চন্দ্র কুর্মি) ১৬। চাহ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির একঝলক দিলেশ্বর তাঁতি । ১৭। ঝুমেই গীতর মাজে মাজে সোমেশ্বর মাঝি । ১৮। উড়ে সেন্দা ফুল গইন্দা ওরাং । ১৯ । ডমক্চ রুক্মধর বুঢ়াগোহাঁঞি । ২০। করম পূজা আরু ঝুমুর গীত (সম্পাদনা মাখনলাল বাড়ৈ এবং বিপিন চন্দ্র মাহাতো) ২১। 'জননী' আলোচনী সম্পাদনা বিশ্বেশ্বর বরাই । ২২। সেউজ পত্র আলোচনী সম্পাদনা সঞ্জয় কুমার তাঁতি । ২৩। আঙনা নরেন বরা । ২৪। চাহ বনুয়ার আদি কথা আরু চমু ইতিহাস, এবং ২৫। চাহ শিল্পর আদি কথা আরু অসমত চাহ খেতি দণ্ডেশ্বর শইকিয়া । ২৬। চাহ বাগিচার শ্রমিক আরু আইন প্রসেনজিৎ চৌধুরী । ২৭। অসমর চাহ বনুয়া আরু উনিশ শতিকার বিদ্বৎ সমাজ চামডাং সাহিত্য সভার দ্বারা সম্পাদিত ২৮ । চাহ বাগিচার লকগীত।"[১০] লোকসাহিত্য সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ্রমিক অসমে আনা হয় । বিহার, উড়িষ্যা,

পশ্চিমবঙ্গ, অন্দ্রপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ যারা শ্রমিক হয়ে অসমে আসে তারা তাদের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি, লোকাচার, নানা ধরণের গীত, লোকসাহিত্য সঙ্গে নিয়ে আসে । সারাদিন চা বাগানে পরিশ্রম করার পর সন্ধ্যাবেলা সারাদিনের পরিশ্রম ভুলতে তারা নিজেদের মধ্যে নাচ গানের আসর করে থাকে । সময়ের টানা পোড়নে, আর্থিক দুরবস্থার জন্য পেটের দায়ে এখন তারা চা বাগান ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে বাইরে কোথাও । ফলে সন্ধ্যাবেলা সেই নাচ গানের আসর আর বসছে না । তবে বিশ্বায়নের জাঁতাকলে তা পুরোপুরি পিষ্ট হয়েও যায় নি । এখনও দোল, দুর্গোৎসব কিংবা করম উৎসবের সময় ঝুমুরের সুর কানে আসে । রয়েছে তাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র, ঢোল, বাঁশি, ঝাঁঝ, ডুগডুগি, মাদল, প্রভৃতি সহযোগে ঝুমুর নাচ সবার মন মাতিয়ে তোলে । গানগুলোতে ওঠে আসে তাদের সুখ দুঃখ, জীবন প্রণালী, ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা, ওঠে আসে সামাজিক নানা দিক ।

১। কাঠিয়া লেলি গছা গছা
সারি সারি লাগালি 'গো' ধান
সুখে দুঃখে জীবন গাঁথা
বকা- পানী হামদের প্রাণ ।

২। বৃন্দাবনে বাজল বাঁশি গকুলেতে শুনেছি
আর বা জনা প্রেমের বাঁশি
ধুলাই লুটে নাচেছি ।

৩। গাছ মধ্যে তুলসী

পাতার মধ্যে পান গো

নারীর মধ্যে রাধিকা

পুরুষ ভগবান গো ।

এখানে চা শ্রমিকদের সমাজে বিয়েতে মেয়েদের সিঁদুর পোরানোকে তুলসীর সঙ্গে তুলনা করে, সমাজে পানের আদর আর সংসার জীবনে স্বামীকে ভগবান রূপে জ্ঞান করার প্রচলনটি ধরা পড়েছে ।

৪। আয়রে বাণ্ডিয়া শিয়াল

ঘর পিন্দারে থাক

বাবুর মা জলকে গেলে

বাবুর কান কাট ।

৫। হামরা লাগি আসামবাসি

নানা জাতি উপজাতিরে

সবাই মিলে গরিব সোনার আসাম

আসাম হামার প্রাণেরও প্রাণ ।

চা শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির লোক রয়েছে, ফলে কালের বিবর্তনে চা জনজাতি সংস্কৃতি বলে কেউ কেউ তাকে এক করে দিলেও আসলে তাদের প্রত্যেকরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি । চা শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছে চিকিৎসা, থাকার ঘর, রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা সব দিক থেকে । চা বাগান গুলোতে রয়েছে অনেক সম্প্রদায়ের লোকেরা । এত প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা রোজ লড়ে যাচ্ছে নতুন সূর্য ওঠার অপেক্ষায় ।

ত্রিপুরা অঞ্চল

ত্রিপুরা অঞ্চলের চা শ্রমিকরাও প্রতিদিন জীবন যুদ্ধ করে যাচ্ছে । থাকা খাওয়া, ওষুধপত্র, শিক্ষা বরাক উপত্যকার মতো তারাও ওগুলো থেকে বঞ্চিত । সেখানেও অনেক চা বাগান রয়েছে; এবং তাদেরকেও ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক উপত্যকার মতোই একসময় আড়কাঠি সহযোগে নিয়োগ করা হয় বাগানগুলোতে । এইসব চা শ্রমিকরাও তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি । ত্রিপুরায় ১৯৭১ এ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসও রয়েছে। ভারতবর্ষের প্রথম শ্রমিক সমবায় পরিচালিত চা বাগান ত্রিপুরার 'কো অপারেটিভ চা বাগান' যা এখন ও তারা চালিয়ে যাচ্ছেন । ত্রিপুরার প্রথম চা বাগান হল হিরাছড়া, কৈলাশহর, ১৯১৬ ১৭ খ্রিষ্টাব্দে । বেশ কয়েকদিন থেকেই তা রুগ্ন অবস্থায় রয়েছে । পাশের চা বাগান মতিছড়াতে ক্ষেত্র সমীক্ষণ করতে গিয়ে জনৈক ব্যক্তির সাথে কথা বলে সেখানকার শিক্ষা সম্পর্কে জানা যায়, ১৯৮৬ সালে যেখানে উক্ত বাগানে মাধ্যমিক পাশের হার প্রায় ১০ শতাংশ ছিল সেখানে আজকাল ছেলমেয়ারা এম এ, বি এ পড়ছে । আগে শ্রমিকরা চা বাগানের কাজ ছাড়া অন্য কোথাও গিয়ে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারত না এখন কিন্তু শিক্ষার কারণেই তারা বাইরে যাচ্ছে কাজ করছে । পুনেতে যাচ্ছে 'ফিল্ম ইনস্টিটিউট' এ কাজ করছে । গুজরাট এ 'হোটেল বয়' এর কাজ করছে ইত্যাদি । এদিক দিয়ে শিক্ষার উন্নতি হয়েছে বলা যায় । যেমন এখন ওরাং ছেলে মেয়েরা সাইকেল দিয়ে পড়তে আসছে যা আগে ভাবা যেত না । ত্রিপুরার রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, চিকিৎসা ব্যবস্থা সবই সরকার থেকে সুবিধা জনক ভাবে দেওয়া হচ্ছে মোটামুটি । বর্তমানে মনুভেলী চা বাগান এই বেশ একটা ভাল অবস্থায় রয়েছে, আর

অন্যান্য গুলোকে রুগ্ন অবস্থায় রয়েছে বলা যায় । বর্তমান ত্রিপুরা হল পার্বত্য ত্রিপুরা, আর বৃহত্তর ত্রিপুরা হচ্ছে কুমিল্লা নিয়ে । ত্রিপুরার অনেক চা বাগান রয়েছে যেখানে স্বাধীনতার ও ইতিহাস রয়েছে । কালিশাসন বলে একটা জায়গা, যেখানে বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল বলে স্থানীয় তথ্যসূত্রে জানা যায়। বিনয় বাদল দীনেশও একসময় বাগান গুলোতে এসেছেন । সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে শহরের তুলনায় চা বাগান গুলোতেই এর সূচনা হয় যাত্রাগানের মধ্যে দিয়ে । শহরে তখনও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আসে নি, কিন্তু চা বাগানে ছিল, সাল ১৯১৬ মতিছড়া চা বাগানে এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল । চা বাগানে চাকরি করাও ছিল তখন একটা বেশ আভিজাত্যের বিষয়, বাবুরা সবাই বাঙালি থাকাতে যাত্রা, গান বাজনার আসর ছিল । এখানে আরেকটা জিনিষ উল্লেখ্য যে ধীরে ধীরে দেখা গেল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির মানুষদের আনানো হয় চা বাগান চালানোর জন্য এবং সেই সঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলটাই একটা ক্ষুদ্র ভারতবর্ষের মতো হয়ে যায় । একটা মিশ্রসংস্কৃতিও গড়ে ওঠে । যা আজও বহমান । চা জনজাতিদের মধ্যে, বাউরি, সাঁওতাল, মুণ্ডা, সবর, বিশেষ করে হোলির সময় দেখা যায় যে, সবাই নিজের মতো করে নাচ করছে । বিষয় আবার একই । উড়িষ্যার লোকেরা রাধাকৃষ্ণ নিয়েই নাচ করছে কিন্তু নাচের ধরণ আলাদা । সবর সম্প্রদায় করছে কাঠি নাচ । বাউরি সম্প্রদায় খোল করতাল নিয়ে কীর্তন করে । ওরাং, সাঁওতাল, বাউরি, সবর, কুম্ভকার, দাঁড়াই, তন্তুবায়, মাল, খাড়িয়া, ভূমিজ, ভর, গোয়ালা, যাদব, কৈরি ইত্যাদিরা সবাই আলাদা আলাদা করে নিজের মতো করে উৎসবে মেতে ওঠে । এইসব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে আমরা সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাং এবং ভিল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক কিছু উপাদান

এখানে তুলে ধরতে পারি । সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নিজস্ব কতগুলি প্রথা বা রীতিনীতি ইত্যাদি রয়েছে, যাকে বলা হয় সর্দার প্রথা । কৃষিকাজ এবং মাছ চাষের সঙ্গে তারা যুক্ত । রয়েছে তাদের নিজস্ব উৎসব আচার অনুষ্ঠান । বসন্ত উৎসবেও তারা ছেলে মেয়ে মিলে নাচ করে থাকে ।

সাঁওতালদের পরই আসে ভিল সম্প্রদায় । এঁরা অনেক দিন থেকেই ত্রিপুরাতে বসবাস করছে চা শ্রমিক হিসেবে । মূলত কৃষি, মাছ চাষ এবং পশু শিকারই তাদের কাজ । খুব কম সংখ্যক ভিলেরা ত্রিপুরাতে আছে । সাঁওতালদের মতো এদের কৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় না যদিও তবে এরা একধরনের নাচ করে থাকে, যাতে শুধু ছেলেরাই অংশগ্রহণ করে । তাদের কীর্তন সংস্কৃতির একটি বড় উপাদান বলা যেতে পারে ।

ওরাংদেরও জীবন যাপন আসলে কৃষিভিত্তিক, এছাড়াও তারা মাছ চাষ, পশু শিকার, বন্যপ্রাণী শিকার করে থাকে । আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা এই জনগোষ্ঠীরও জীবিকা নির্বাহ বা পরিবার চালানোই বড় কথা । ওরাংদের প্রধান উৎসব হচ্ছে করম উৎসব, যাকে ঘিরে তারা নাচ করে থাকে। এছাড়াও তারা ফাল্গুন মাসে এক ধরণের নাচ করে থাকে যাকে বলে তারা ফাগুয়া নাচ । এই নাচে তাদের হাতে কাঠি থাকে । এছাড়াও তারা আরেকটা নাচ করে যা আমাদের সবার পরিচিত ঝুমুর নাচ । ঝুমুর নাচ এবং ঝুমুর গান তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি ।

মুণ্ডাদের সাংস্কৃতিক জগত বেশ সমৃদ্ধ । তদের মধ্যে যুবক যুবতীরা গ্রামে গ্রামে গিয়েও নাচ গান করে থাকে । মুণ্ডাদের তিনটি উৎসব হল জাদুর, লাসুর, এবং গেলা উৎসব । মূলত চা বাগানকে কেন্দ্র করে এইসব

জনজাতিরা ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস শুরু করে ঠিকই, কিন্তু আসলে তারা একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি করে রেখেছে এখানে ।

পরব / পুজো

চা জনজাতিরা কোন দেবদেবীর সুস্পষ্ট রূপ কল্পনা করে তদনুরূপ মূর্তি নির্মাণ করে পুজো করে না । প্রাচীন কালের মানুষেরাও পুজো করত গাছপালা, মাটি, পাথর ইত্যাদিকে দেবতা ভেবে । কারণ প্রকৃতির প্রতিকূলতায় মানুষ ছিল তখন সম্পূর্ণ অসহায় । ঝড়, তুফান, বজ্রপাত, সর্প ও বিভিন্ন বন্যজন্তুর দ্বারা তাদের মৃত্যু ছিল অনিবার্য । তাই এসব দুর্যোগের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যে তারা চিন্তা ভাবনা শুরু করেছিল । আর এসব চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা আর স্বপ্নের মাধ্যমে তারা কতগুলি দেবদেবীর সন্ধান পেল । বস্তুত এসব দেব দেবীরা হল লৌকিক । এঁদের ছিলনা কোন সুস্পষ্ট রূপ । বিভিন্ন বৃক্ষ, পাথর, মাটির ঢিবি ইত্যাদিকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতে লাগল মানুষ । ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা নিবেদন করে মানুষ প্রার্থনা করল ঐতিহ্য মঙ্গল । কালানুক্রমে মানুষ সভ্য হয়েছে । বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ হয়েছে উন্নত, আগের চেয়ে ভয়মুক্ত । কিন্তু একুশ শতকেও চা জনজাতির সমাজে গাছপালা, জীবন জন্তু, পাথর ইত্যাদির পুজো হতে দেখা যায় । "করম পূজা, জাহের এরা পূজা, ভাক্তি পূজা ইত্যাদি এর প্রমাণ । করম পূজা তো আসলে করম বৃক্ষেরই পূজা । জাহের এরা পূজাও হয় বৃক্ষের নীচে। বাহাবোঙ্গ পুজাতো আসলে প্রকৃতিরই পূজা । শাল, মহুয়া ফুল দিয়ে এ পূজা করা হয় । প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় এই কামনাই এই পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য । প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সুসভ্য শিক্ষিত হিন্দু জাতিও তুলসী, বেল, বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি গাছগুলিকে পবিত্র বিবেচনা

করে পূজা করে আসছে।"[১১] । ত্রিপুরাতে রাজ্য সরকার এর তরফ থেকে করম উৎসবের আয়োজন করা হয় । উদ্দেশ্য লোক ঐতিহ্য গুলোকে ধরে রাখার জন্য । এছাড়াও আরও অনেক পুজো পার্বণ রয়েছে ত্রিপুরা অঞ্চলের চা জনজাতিদের ।

সামাজিক আচার অনুষ্ঠান

- সামাজিক সব আচার অনুষ্ঠানে গানের ব্যবহার দেখা যায় । জন্ম মৃত্যু বিবাহ, সবকিছুতেই গান বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছে । মৃতদেহ সৎকার এর সময় তারা দেহতত্ত্ব এর গান করে থাকে । বাউরি সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে তার প্রচলন বেশি । শোক ভোলানোর জন্যই তো কীর্তন, তারা হরে কৃষ্ণ হরে রাম এর পরিবর্তে যেসব দেহতত্ত্বের গান করে তা যেন একটা অন্য আবহ তৈরি করে দেয় । যা কোন কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তির চোখেও জল এনে দিতে পারে । রয়েছে সামাজিক আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ঝুমুর গান ও নাচ । ব্যাপার হল বিশ্বায়নের যুগে সমকালীন পণ্য সংস্কৃতিতে অন্যান্য জাতিদের মতো তাদেরও একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় । ফলে তাদেরও হাতে মোবাইল রয়েছে, বাড়িতে বসে টেলিভিশনে সিরিয়াল, আন্তর্জাল (ইন্টারনেট, সোসিয়াল মিডিয়া ইত্যাদি) ব্যবহার করছে । সবকিছুরই তো ভাল এবং খারাপ দুটো দিকই থাকে । ভাল দিক হল কয়েক দশেক আগে চা বাগানে এরকম দৃশ্য ভাবা যেত না, বিশ্বায়নের কল্যাণেই তো আজকে একটা চা শ্রমিকের ছেলে মোবাইলে বসে বন্ধুকে বার্তা (ম্যাসেজ) পাঠাচ্ছে। কোথাও একটা আলো তো পৌঁছেছে শিক্ষার সেটা নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না । ব্যাপার হল এই সবকিছুই তারা করছে

তাদের সামান্য দৈনিক মজুরি ৮৩ টাকা দিয়েই, কারণ সে তো আর নিজেকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছে না । খারাপ দিক হল তারা পুজো করছে, উৎসব করছে কিন্তু তাদের গানবাজনা আর শোনা যাচ্ছে না সেখানে জায়গা করে নিয়েছে আধুনিক সিনেমা জগতের গান ও ভাবনা । আগে অন্যান্য চা বাগানের মতোই ত্রিপুরা অঞ্চলের চা জনজাতিরা 'তলব বার' (সাপ্তাহিক বেতন) হলে টাকা পেলেই খেয়েদেয়ে সব উড়িয়ে দিত । এখন আর এরকম হচ্ছে না, সঞ্চয়ের মানসিকতা তাদের এসেছে, আবার বেশি সঞ্চয়ের মানসিকতা থেকেই চিটফান্ড গুলোর হাতেও পড়তে হচ্ছে । ওঝাগুনিন, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি বরাক উপত্যকার চা বাগানের মতো ত্রিপুরা অঞ্চলেও রয়েছে । সাহিত্যের দিক দিয়ে দেখলে সৃষ্টিশীল সাহিত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে এখনও পাওয়া যায় নি, বরাক উপত্যকা এদিক দিয়ে এগিয়ে আছে । তবে লোককথা, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি রয়েছে । যেগুলো সংগ্রহের একটা প্রয়োজন রয়েছে ।

ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে মনুভেলী চা বাগানের বাণিজ্য ব্যবস্থাপক শ্রী প্রবীর দে মহাশয়ের সাথে কথা বলে সর্বমোট চা বাগান সম্পর্কে জানা যায় ।

ত্রিপুরা অঞ্চলের সর্বমোট চা বাগান

ধলাই জেলা

১। দরংটিল্লা চা এসএসএস লিমিটেড ।

২। রামদুরলভপুর চা বাগান ।

৩। মহাবীর চা বাগান ।

৪। মায়াংটুকু কোওপারেটিভ চা বাগান ।

৫। ইছাক চা এসএসএস লিমিটেড ।

৬। ধলাই টি প্রসেসিং কোওপারেটিভ ফ্যাক্টরি ।

খোয়াই জেলা

৭। কল্যাণপুর চা বাগান ।

৮। খোয়াই চা বাগান ।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

৯। রানিবাড়ি চা বাগান ।

১০। সোনামুখি চা বাগান ।

১১। তাছাই চা বাগান ।

১২। মূর্তিছড়া চা বাগান

১৩। রাংরুং চা বাগান ।

১৪। দেবস্থল চা বাগান ।

১৫। নট্টিংছড়া চা বাগান ।

১৬। সোভা চা বাগান ।

১৭। হালাইছড়া চা বাগান ।

১৮। ধর্মনগর টি প্রসেসর প্রাইভেট লিমিটেড ।

১৯। মাছমারা চা বাগান ।

২০। মনু চা বাগান ।

২১। পেয়ারাছড়া চা বাগান ।

২২। মহেশ্বর চা বাগান ।

২৩। সরলা চা বাগান এবং সুবর্ণ চা বাগান ।

২৪। হাফলংছড়া চা বাগান ।

২৫। ধর্মনগর চা বাগান ।

২৬। গোলকপুর চা বাগান ।

২৭। মনুভেলী চা বাগান ।

২৮। জগন্নাথপুর চা বাগান ।

২৯। সরজিনি চা বাগান ।

৩০। কৈলাশহর চা বাগান ।

৩১। ফণীন্দ্রনগর চা বাগান ।

৩২। হিরাছড়া চা বাগান ।

সিপাহীজেলা

৩৩। বসুন্ধরা চা বাগান ।

৩৪। কমলেশ নগর চা বাগান ।

৩৫। হরিষনগর চা বাগান ।

দক্ষিণ ত্রিপুরাজেলা

৩৬। লুধুয়া চা বাগান ।

৩৭। লীলাগড় চা বাগান ।

৩৮। দিমাতালি চা বাগান ।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

৩৯। ফটিকছড়া চা বাগান ।

৪০। মেখিলপাড়া চা বাগান ।

৪১। দুর্গাবাড়ি চা বাগান ।

৪২। মেসার্স আদরিনি চা বাগান ।

৪৩। গোপালনগর চা বাগান ।

৪৪। হরিদাসপুর চা বাগান ।

৪৫। সেন্ট্রাল টি প্রসেসিং ফ্যাক্টরি ।

৪৬। শিমনাছড়া চা বাগান ।

৪৭। বিনোদিনী চা বাগান ।

৪৮। হরেন্দ্রনগর চা বাগান ।

৪৯। কালাছড়া চা বাগান ।

৫০। মোহনপুর কোওপারেটিভ চা বাগান ।

৫১। কোলকলিয়া চা বাগান ।

৫২। মেগলিবুন্ধা চা বাগান ।

৫৩। ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান ।

৫৪। তুফানিয়ালুঙ্গা চা বাগান ।

৫৫। লক্সমিলুঙ্গা চা বাগান ।

৫৬। কৃষ্ণপুর চা বাগান ।

৫৭। নরেন্দ্রপুর চা বাগান ।

৫৮। মালাবতী চা বাগান ।

বলা যেতে পারে ফাঁকির ফাঁদে পড়া এই সব জনজাতিরা যে জায়গারই হোক না কেন এদের অবস্থান আসলে একই । শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা এই সব জনগোষ্ঠীর পিছু ছাড়ে নি । বরাক উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, ত্রিপুরা অঞ্চলের চা জনজাতিদের অবস্থান প্রায় একই, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এসে দাঁড়িয়েও তারা শাসন এবং শোষণের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি । শুধু মুখোশ পাল্টায়, মুখ একই থেকে যায় । যেখানে আর্থ সামাজিক অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয় নি অথচ তারা দিনরাত লড়ে যাচ্ছে, নিজের সাথে, প্রকৃতির সাথে, ঔপনিবেশিক মুখোশধারি শাসকদের সাথে । এত অভাব অনটন এর মধ্যেও তারা বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের সংস্কৃতি, পৃথিবীর আর ক'টা জাতি পারে এরকম । তাদের নাচ গানই বোধয় তাদেরকে বাঁচতে শেখায়, স্বপ্ন দেখতে শেখায় নতুন সূর্য ওঠার !

তথ্যসূত্র

১। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতে কৃতদাস প্রথা,দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, পৃষ্ঠা ১৪ ।

২। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতে কৃতদাস প্রথা, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, পৃষ্ঠা, ১৪ ।

৩। বিবর্তনত চাহ জনগোষ্ঠীর জীবন আরু সংস্কৃতি, বিপিন চন্দ্র মাহাতো,আঙ্গিক প্রকাশন, গুয়াহাটি । প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা ১৬১, (বাংলা অনুবাদ) ।

৪। বিবর্তনত চাহ জনগোষ্ঠীর জীবন আরু সংস্কৃতি, বিপিন চন্দ্র মাহাতো,আঙ্গিক প্রকাশন, গুয়াহাটি । প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা ১৬১, (বাংলা অনুবাদ)

৫। বিশ্বায়ন, চাহ শিল্প এবং শ্রম আন্দোলন, প্রহ্লাদ চন্দ্র তাছা, সেউজিয়া সোন, শ্রী ভূমেশ চন্দ্র দত্ত(সম্পাঃ), স্মৃতিগ্রন্থ, (বংলা অনুবাদ) ।

৬। চা জনজাতির ছাত্র ছাত্রীর জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা,শ্রী গণেশ চন্দ্র কূর্মি, সেউজিয়া সন, শ্রী ভূমেশ চন্দ্র দত্ত(সম্পাঃ), স্মৃতিগ্রন্থ, (বংলা অনুবাদ) ।

৭। চা বাগিচার শৈক্ষিক পরিবেশ, হেমপ্রভা তাছা,সেউজিয়া সোন,শ্রী ভূমেশ চন্দ্র দত্ত(সম্পাঃ), স্মৃতিগ্রন্থ, (বংলা অনুবাদ) ।

৮। মহিলা সাবলীকরণে চা জনগোষ্ঠীর মহিলা বর্ণালী শর্মা বরুয়া, রোওনী, অশ্বিনী গোস্বামী (সম্পাঃ), রাজগড় রোড, গুয়াহাটি । (বংলা অনুবাদ) ।

৯। বিবর্তনত চাহ জনগোষ্ঠী জীবন আরু সংস্কৃতি, বিপিন চন্দ্র মাহাতো, আঙ্গিক প্রকাশন, গুয়াহাটি, (বংলা অনুবাদ) ।

১০। বিবর্তনত চাহ জনগোষ্ঠী জীবন আরু সংস্কৃতি, বিপিন চন্দ্র মাহাতো, আঙ্গিক প্রকাশন, গুয়াহাটি, (বংলা অনুবাদ) ।

১১। ত্রিপুরার উপজাতি জীবনচিত্রে মুন্ডা, ওরাং ও সাঁওতাল, ডঃ রবীন্দ্র কুমার দত্ত, ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, দত্ত সুপার মার্কেট, শকুন্তলা রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ।

-